সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

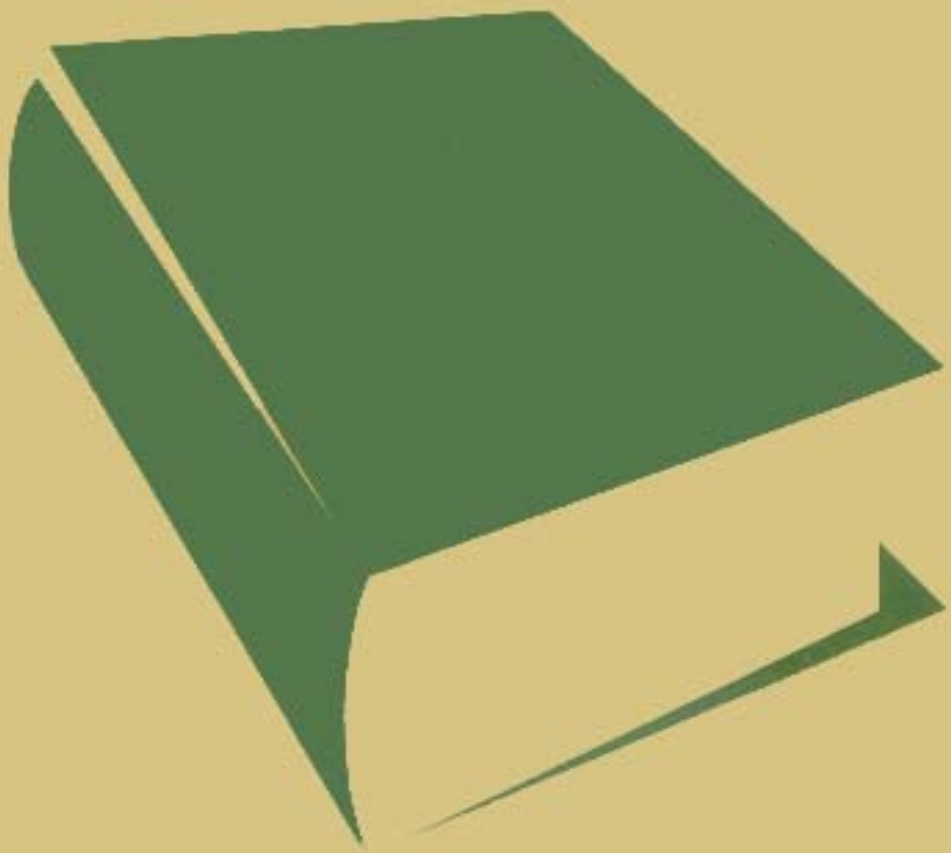

ডক্টর হাসান জামান

amarboi.org

আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে তমদ্দুন বা সংস্কৃতির জন্ম হয়। তমুদ্দনের অগ্রগততিতে সাধনা ও অভিজ্ঞতা-এ দুটো জিনিস সমানভাবে পাশাপাশি কাজ করে চলে। সভ্যতা সংস্কৃতি সাধনাসাপেক্ষা। কষ্ট করে, প্রচেষ্টা চালিয়ে যা অর্জন করা গেল, তা বিস্মৃতি হলে পর যে সার বস্তুটুকু বেঁচে থাকে, তাই হলো মানব-সব্যতার অন্তনির্হিত নির্যাস-আর তাকেই বলতে হবে তমদ্দুন। সংস্কৃতি কথাটা সেই কারণে অনেক রিফাইনমেন্ট অর্থে ব্যবহার করতে প্রয়াসী : আবার কেউ বা মানবকল্যাণমুখীনতাকে তমদ্দুনের আসল জিনিস বলে তুলে ধরেন। কারো কারো মতে, বুদ্ধিমত্তার কায়েমী আসন পাতা তমুদ্দনের মাঝে কোন বিশেষ যুগের ও দেশের জনসাধারণের বুদ্ধির সেই যুগের ও দেশের সাংস্কৃতিক মূল্য মোটামুটি তমদ্দুনকে আমরা দুভাগে ভাগ করে দেখতে পারি: ১। আদর্শিক বা সার্বজনীন আদর্শভিত্তিক তমদ্দুনও ২। আদর্শহীন বা আকস্মিক তমদ্দুন। আদর্শগত তমুদ্দনকে আবার দুপর্যায়ে ভাগ করা চলে: ক. বস্তু ও আত্মার সমন্বয়গত তমদ্দুন ও খ. বস্তুগত তমদ্দুন। ইসলাম ও অন্যান্য সার্বজনীন ধর্মের উপরে ভিত্তি করে যে তমদ্দুন গড়ে ওঠে, তাকে প্রথম বা ক পর্যায়ে এবং ফ্যাসিজম, নাৎসীজম ও মার্কসীয় সাম্যবাদ বা কমিউনিজমকে দ্বিতীয় বা খ পর্যায়ভূক্ত করা যায়। আবার আদর্শহীন তমদ্দুনকে ক, জাতিভিত্তিক ও খ. স্থান ভিত্তিক এই দুভাগে ভাগ করা চলে জার্মান সাংস্কৃতি মূলত জাতিভিত্তিক ও আধুনিক ভারতীয়, বৃটিশ ও মার্কিন সংস্কৃতি স্থানভিত্তিক। আমরা তাই চার রকমের তমদ্দুন, জাতিভিত্তিক তমদ্দুন ও স্থান ভিত্তিক তমদ্দুন।

আদর্শমূলক তমদ্দুন ও আদর্শহীন তমদ্দুনে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। আগর্শগত সংস্কৃতিতে আদর্শকে সচেতনভাবে সমাজ জীবনে রূপায়িত করা, অপরদিকে আদর্শহীন তমদ্দুনে জাতি ও স্থানকেই সংস্তৃতির প্রধান ভিত্তিরূপে গণ্য করা চলে। জাতি ও স্থানকেই এখানে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোন সার্বজনীন আদর্শের উপর ভিত্তি করে সমাজ সংগঠন করা এই তমদ্দুন গুলোতে খুব বেশী বড় ব্যাপার নয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে সব রকমের আদর্শহীন সংস্কৃতিকে সুবিধাবাধী সংস্কৃতিও বলা যেতে পারে। আবার একান্ত ভাবে বস্তুভিত্তিক সংস্কৃতিআদর্শবাদী হলেও আত্মজ্ঞানের অভাবে ও মানবচেতনাকে পরিপূর্ণকে বস্তুগত বলে মনে করার দরুন শেষ পর্যন্ত সুবিধাবাদী সংস্কৃতিতে পর্যবসিত হতে পারে। মার্কসবাদ এরূপ একটি বস্তুভিত্তিক তমদ্দুন। এই জীবন প্রচেষ্টার নাম হলো সংস্কৃতি। জীবন সংগ্রামের প্রকৃতির উপর অধিকার বলতে বুঝায় উৎপাদন শক্তি ও তার বিভিন্ন আকার-প্রকারের হেরফের। এ মতবাদের অনুযায়ী উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের মাঝে সংস্কৃতির বিবর্তনের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধিতকে সংস্কৃতির মাল-মসলা হিসেবে ধরে না নিয়ে এ শক্তিকে মার্কসবাদে এক একচ্ছত্রনীতি বা প্রিনন্সিপাল হিসাবে ধরে নেয়া হয় ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতার মারফত এই পদ্ধতি মানবতা ও মানবাধিকারকে ছাপিয়ে নৈতিক বা মরার মান নির্ণয়ে তৎপর হয়ে থাকে।

ইসলামী জীবনদর্শনে যে তমদ্দুনের জন্ম দিয়েছে, তা হলো একটি আদর্শ-ভিত্তিক তমদ্দুন। তবে আদর্শগত তমদ্দুন বলেই কোনমতে একে সংকীর্ণ বা কুপমুন্ডুক সংস্কৃতি বলা যায় না। কারণ ইসলামী জীবনদর্শন সর্ব দেশ, কাল, দর্শন ও তমদ্দুন থেকে বিনয়ের সাথে যা কিছু সুন্দর মহান চিরন্তন, কল্যাণকর, তাকে সাদরে বরণ করে নিতে উদাত্ত আহবানে জানিয়েছে বারে বারে। তবে যেসব ভাল জিনিস গ্রহণ করা হলো, তাকে ইসলামে ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তৌহীদবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি সব মানুষের, সব জাতির, দেশের ও কালের সংস্কৃতি। সেইজন্য এই সাংস্কৃতি বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও দেশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতি, দেশ ও ভাষা হলো তমদ্দুনের অপরিহার্য মাল মসলা। কিন্তু এই সংস্কৃতির মূলনীতি ইসলামী জীবনদর্শন ও মানবতার উপায়ে নির্ভর করে। জাতি ও দেশ, বর্ণ ও ভাষঅ এই

সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, যার উপরে নির্ভর করে তার বিরাট সৌধ ও শাখা-প্রশাখা। যে তমদ্দুন আদর্শহীন, তাতে মূল্যবোধের কোন বিশেষ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাইনা। আর তার পেছনে কোন সচেতন ও সংবেদনশীল বিকাশ ও বিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই বুঝা গেল যে, আদর্শিক সংস্কৃতির মাপকাঠিতে এবং আকস্মিক সংস্কৃতি ও সাধারণ সমাজবৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মাপকাঠিতে পার্থক্য বিস্তর। ইসলামী সংস্কৃতি মূলত আদর্শিত, কার্যত সমাজতাত্ত্বিক আর আদর্শহীন তমদ্দুন মূলত আকস্মিক, কার্যত সমাজতাত্ত্বিক। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে দুটো আকস্মিক, কার্যত সমাজত্ত্বিক। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে দুটো সংস্কৃতির বাহ্যিক সাদৃশ্যই তাদের পারস্পরিক সমতা সপ্রমাণ করে। যেমন যুক্ত প্রদেশের এবং কাশ্মীরের হিন্দু ও মুসলমান আর আরবদেশের খৃষ্টান ও মুসলমান। কিন্তু আদর্শিক সংস্কৃতির বিচারে সংস্কৃতির বিচারের এই মানদন্ড ও পদ্ধতি একেবারে কৃত্রিম। কোন এক দেশের আদর্শগত সংস্কৃতির অপর এক দেশের আর্দশগত সংস্কৃতির বাহ্যিক দিক থেকে পৃথক হতে পারে। (আর এর ফলে সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক বিচারে তারা দুই সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হবে। যেমন সিরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইসলামী সংস্কৃতির জাতিভূক্ত আর বর্তমান চীন ও রাশিয়া কমিউনিষ্ট সংস্কৃতির গোষ্ঠীভূক্ত। অবশ্য একথা সত্য যে, মূল্যবোধ এক হলে, কালচার ও তমুদ্দনের বাইরের দিকটা কোন কোন ক্ষেত্রে এক রকম হতে পারে। আবার দেশ, কাল, বণৃ ও ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে সেই

.....

সংস্কৃতির মাপকাঠিতে একই সংস্কৃতিভূক্ত বলে গণ্য হতে পারেন না। আল-কুরআন একথা খুব স্পষ্ট করেই বলেন: মহান আল্লাহ মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন; (সূরা আর রহমান : ৫৫ : ১-৪)। সেই হিসাবে দুনিয়ায় সব ভাষাই সংস্কৃতির ভাষা।

প্রতিটি ভাষা আল্লাহর দোয়া শক্তি থেকে উদ্ভূত। তৌহীদজাত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের আহবান নিয়ে সমগ্র মানবাতির জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তবে প্রাথমিক দিকে আরববাসীকে তিনি অজ্ঞানতা থেকে নিয়ে এলেন আলোর পথে। তাই বলা হল : কুরআকে আমরা তোমাদের নিজের ভাষায় তৈরী করেছি, যাতে তোমরা সাবধান বাণী শুনতে পাও। (আল লোকমান :৪৪-৫৮) কুরআনের মতানুসারে মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বরগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষার ভেতর দিয়েই ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। আমরা একজন রাসূল (সা) পকে পাঠাইনি, যিনি তাঁর গোষ্ঠীর নিজের ভাষার মারফতে প্রচার করেননি, যাতে করে তারা আল্লাহর কালাম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। (ইবরাহীম ১৪ : ৪)। ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টির বৈচিত্র ও মহিমা ঘোষণা করে। তাঁর (আর) নির্দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে; আসমান যমীনের সৃষ্টি আর বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র; এর মধ্যে সব মানুষের জন্য রয়েছে অগণিত নিদর্শন; (৩০ : ২৭-২৮)। সব ভাষাই ইসলামী ভাষা ও ইসলামের জীবনদর্শন কোন একটা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা হবে ইসলামের তমদ্দুনী ভাষা। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে মানবতার উদ্বোধন ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের নামই হল ইসলামী সংস্কৃতি। আল্লাহ বলেন :বিভিন্ন জাতিকে পারস্পরিক আদান-প্রদান, পরিচিত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্যই পয়দা করা হয়েছে। তবে কেবল মাত্র সে জাতিই শ্রষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে, যারা সৎ ও মহৎ। কোন একটি ভাষায় কথা বলাই ভালো, আর অপর একটি ভাষায় কথা বলা খারাপ-এই মতবাদ ইসলাম-বিরোধী। উগ্র গোষ্ঠীবাদ ও জাতীয় অন্ধতার ফলে উগ্র জাতিগত অন্ধতাকে অনেকদিন ধরে ইসলামের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই মানসিকতার সঙ্গে ইসলামী জীবনর্শনের কোন রফা হতে পারে না। কারণ ইসলামে কোন একটি ভাষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড নয়, নীতিজ্ঞান ও তার বাস্তব রূপায়নই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র নিরিখ।

ইসলাম তমদ্দুন জাতিগত অন্ধতা মানে না। অরিজিন্যাল ও কনভার্টেড মুসলমানে এই সমাজ ব্যবস্থার আওতায় কোন পার্থক্যই স্বীকার করা হয় না। রক্ত, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে মুসলমানের ঐক্য নয়, আদর্শের দিক থেকেই মুসলমান একসূত্রে বাঁধা।

amarboi.org

সংস্কৃতির বিকাশে সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই এক একটি জাতি তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশ করবার সুযোগ পায়। প্রাচীনকালে ব্যাকরণের সঙ্গে মিলিয়ে যা পড়া হতো, তাকে বলা হতো সাহিত্য। সাহিত্যের এই ধাতুগত ব্যাখ্যা এর অন্তর্নিহিত ভাবটার প্রকাশ করতে পারে না। কথার মধ্যে যে শিল্পজ্ঞান আছে, যে রসবোধ আছে, তা হলো সাহিত্যের অর্ধভাগ। সাহিত্যের প্রকাশধর্ম হলো কাল্পনিক, সৃষ্টির আবেগে যে মানব সংগীত কথার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তাই সাহিত্যে যদি কোন উপদেশ থেকে যায়, তা ইংগিতে-ইশারায়, আকারে-প্রকারে প্রকাশ পাবে, তার মধ্যে ফুটে উঠবে এমন একটি সাবলীলতা ও অপরূপতা, যার নাম এক কথায় দেয়া চলে কান্তা-সম্মিত। যে জাতির জীবন লক্ষ্যহীন, যার কিছু পাবার নেই, তার বলবারই বা কি থাকে? যে জাতির কোন জীবনবোধ নেই, যার জীবন আদর্শহীন, তার সাহিত্যিক স্ফুরণ হবার নয়। কারণ সাহিত্য মানুষের জীবন সাধনা ও জীবন প্রবাহের নব নব রূপায়ণ।

ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণাকে অযথা জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে : সেটি হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে ধর্ম বিশেষভবে পরিপন্থী। কারণ ধর্ম মানলে নাকি সাহিত্যিকের রসকল্পনা বিশিষ্ট শ্রেণী-প্রত্যয়ের উপরে উঠতে পারে না, বুদ্ধিদীপ্তির অভাব ঘটে ও সমাজজীবনে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক নীতি, পুরোহিততন্ত্র ও ধর্ম এক জিনিস নয়। সেই সমাজকেই ধর্মীয় সমাজ বলা হয়, যেকানে এই নীতিগুলো সামাজিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ধর্ম একথা প্রমাণ করতে চায় না যে, সমাজে শোষণ নেই। মানব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকা আর শোষক শ্রেণী থাকা এক কথা নয়। শোষণ ও শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করলে যেমন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা যায় না, তেমনি সমাজনীতি ও সামাজিক কার্যপদ্ধতিকে নিছক শ্রেণী-সংগ্রাম ও হিংসাভিত্তিক করে গড়ে তুললে, কি উঁচুদরের সাহিত্য, কি উঁচুদরের সমাজ কোনটাই জন্মলাভ করতে পারে না। তবে সমাজের ও সাহিত্যের যেটুকু উচ্চাংগের ও যেটুকু মংগলময়, সেটুকু অর্জন করা সম্ভব হয় রসবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিভালবদ্ধ জ্ঞানকে শ্রেণীপ্রত্যেয়ের ওপর তুলে ধরেই। তাই সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে যেমন বাস্তবগ্রাহ্য মন চাই, তেমনি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির প্রয়োজনও স্বীকার করতে হবে। সাহিত্য এই দৃষ্টিকোণের স্বীকৃতির মাঝে কেবলমাত্র শ্রেণী-বিচার যথেষ্ট নয়। কেবল রস সৃষ্টির ব্যাপারে কেন, সামাজিক উৎকর্ষের জন্যও এই উপলব্ধিও মানবচেতনা অপরিহার্য। আর সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ এই মানসিকতাকে কোন মতেই খর্ব করে না। কারণ এই মূল্যবোধের মাঝে রয়েছে মানবতার জয়জয়কার।

হরহামেশা একথা বলা হয় যে, ধর্মের আওতায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ নয়। কারণ প্রতিভার বড় গুণ হলো বৈচিত্র ও অস্বীকার করার নেতিবাচক বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি। আসলে সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ বাস্তবে কাজে লাগানো হলে এই বৈচিত্র মৃতকল্প হয়ে যাবার কোন কারণ নেই। সার্বজনীন ধর্মের মূলনীতিগুলো এত ব্যাপক ও সার্বজনীন যে, এর আওতায় মানুষের প্রতিভা নব নব রূপে, রসে, আকারে, প্রকারে আত্মপ্রকাশ করার ভরসা রাখে। বাস্তবে কাজে লাগনো হলে এই বৈচিত্র মৃতকল্প হয়ে যাবার কোন কারণ নেই। সার্বজচনীন ধর্মের মূলনীতিগুলো এত ব্যপক ও সার্বজনীন যে, এর আওতায় মানুষের প্রতিভা নব নব রূপে, রসে, আকারে, প্রকারে আত্মপ্রকাশ করার ভরসা রাখে। মানুষের জীবনবোধ সার্বজনীন না হবার ফলে ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত না হবার ফলেই বরং সাহিত্য ও সংস্কৃতি পঙ্গু, শ্লথগতি, সংকীর্ণ ও মৃতবত হয়ে পড়ে। সার্বজনীন ধর্মের দৃষ্টিতে সব জীবনদর্শনকেই এক-একটি ধর্ম ভলে অভিহিত করা হয় ও সর্বজনীন ধর্ম হলো এক প্রকারের সার্বজনীন জীবনাদর্শ। তাই ধর্মকে এখানে কেবল নীচুদরের লোকদের কালচার মনে করার প্রবৃত্তি নেই বা কালচারকে উঁচু স্তরের ধর্ম মনে করে চিন্তার কুয়াশা সৃষ্টিরও প্রয়াস নেই। ইসলামে পুরোহিততন্ত্র স্বীকৃতি পায়নি। ধর্মকে আমরা যদি পুরোহিততন্ত্র হিসেবে মনে না করি, তবে উঁচু স্তর ও নীচু স্তর সব স্তরের লোকেরই ধর্ম বা জীবনবোধ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তবে সে জীবনদর্শন সর্বজনীন ধর্ম জীবনরোধের অনুসারী কিনা, সে প্রশ্ন বিচারসাপেক্ষ।

ধর্ম কথাটিতে নীতি বা মূল্যবোধ অর্থে গ্রহণ করলে ও সেই মূল্যবোধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পালনে করলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৌণিকতার কোন সম্ভবনা নেই। বহুভঙ্গিম সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রসার আর অসীম কৌতুহল ও বিস্ময়ে দৃষ্টির উৎকর্ষে একান্তরূপেই সম্ভব। ধর্মকে শুধু মানলে হয় না, জীবনকে জীবনবোধের মাধ্যমে জানতে ও জয় করতে হয়, সেটাই আল-কুরআনের সাংস্কৃতিক চিন্তার বড় কথা।

তারপর প্রকৃত ধর্মাদর্শের প্রবণতা মানুষকে বিচ্ছেদের দিকে কিছুতেই টানতে পারে না। কারণ ধর্মের আদর্শ উদার, মানবিক ও সার্বজনীন। এই আদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার ফলেই বিচ্ছেদ, কলহ ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়। অজ্ঞনতার ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িকতা ও নায্য সাম্প্রদায়িক অধিকারের মধ্যে পরপস্পর পার্থক্য নির্ণয় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের আদর্শিক পার্থক্য নির্ণয় করে দিলে সার্বজনীন ধর্মাদর্শ মানুষকে এক করে ভাগ করে না। যদি বলা হয় যে ধর্ম মানুষের-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং ধর্ম চাই না; সুতরাং প্রশ্ন ওঠে মানুষ সম্পূর্ণরূপেভাব ও চিন্তানিরপেক্ষ হতে পারে কিনা। সব মানুষ কমবেশী চিন্তাশীল। তাই মানুষের পক্ষে এটা একেবারেই অসম্ভব। বুদ্ধিমত্তা মানুষের একটা অপরিহার্য গুণ। আর বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বের ফলে মানুষের মধ্যে চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয়। তথাকথিত ধর্ম না চাইলেও জীবনবোধ বা ধর্ম মানুষকে মানুতেই হয়। তবে সে জীবনবোধকে হয়ত দর্শক নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম হয়ত সে মানতে চাইল না, কারণ ধর্মকে সে পুরোহিততন্ত্র বলে ধরে নিল। কিন্তু ধর্মের স্থানে নতুন নতুন দর্শন এসে শিকড় গেড়ে বসে। গণতন্ত্র এলো, তার রকমের অন্ত নেই; সমাজতন্ত্রে, তার আবার হরেক কিসিম, তাই বলে কি জোর করে কোন একটা দর্শন বা ধর্ম মানুষের উপর চাপিয়ে দেবো? আসল কথা হলো, সব ধর্ম ও দর্শককে বেঁচে থাকার অধিকার দান করতে হবে, তাদের বিকৃতি দূর করতে হবে, আর তাদের স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখে নিজ নিজ সার্বজনীন ধর্মে এই মানবিক দিকগুলো বড় করে তুলতে হবে, সার্বজনীন ধর্মে এই মানবিক দিকগুলো বড় করে তুলে ধরতে হবে, সার্বজনীন ধর্মে এই মানবিকতার অভাব নেই, কারণ জ্ঞানের সাধনা ও অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের প্রতি উদারতা এর একটা মূল্যবান নীতি। এ মানবিকতার (উদ্র গোষ্ঠীবদ্ধতার নয়) ওপরে ভিত্তি করে মানব অধিকারের স্বীকৃতি ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থার মূল নিরিখ। চলিষ্ণু জগত ও সমাজের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা এই জীবনবোধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জীবনব্যবস্থায় ধর্মের ব্যাখ্যায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের নীতি মারফত মানুষের বুদ্ধি ও আত্মার মুক্তি ষোষণা করেছে ও বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রাখতে দিয়েছে অপুরন্ত প্রেরণা। তবে যে পরিমাণে বুদ্ধির লম্ফন-কুর্দন মানবতা ও সাধারণ মানুষের অধিকারগুলোকে লংঘন করে যায়, সেই পরিমাণে ইসলামী দর্শনের মূল্যবোধ-অনুগ ও মানবিক হওয়া বাস্তব মুক্তি ও মানসিক স্ফূর্তি চেয়েছে, কিন্তু এর কুর্দন-কোলাহল বরদাশত করেনি। অবশ্য এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ ও ধর্ম ব্যবসায়িগণ ইসলামের বহু বিঘোষিত বুদ্ধিদীপ্তিকেও অনেকে সময়ে ইসলাম-বিরোধী বলে ফতোয়া দিতে ছাড়েনি। হৃদয়ের মূকুক্ষা ও চিন্তার বিপ্লব মূলত ইসলামের অনিভিপ্রেত হতে পারে না। ইসলামী সাহিত্যের সহজ স্বীকৃতির মাঝে রয়েছে বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সুষ্ঠতা নিয়ে আসার তাগিদে। রাশিয়ার পীটার দি-গ্রট এর বা তুরস্কের সুলতানের মত তামদ্দুনিক শুদ্ধিকরণ নয়।

এই কারণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য কেউ যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রত্যাশা করেন, তা হবে নিতান্ত স্বাভাবিক। তাকে শরীয়তের হুবুহু প্রবর্তন বললে ভয়ানক ভুল করা হবে। কারণ ধর্মের সর্বকালীন মূল্যবোধের পেছনে রয়েছে মানবচিত্তের চিরন্তন স্পন্দন। যে সদাজাগ্রত চিন্তা ইসলামী সাংস্কৃতির নব নব সম্ভবনার ইঙ্গিত, তাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বা জাতিতে গোল বাধতেই পারে না। যিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম পালন করেন, তিনি ধর্মের আপাত বিরোধিতার মাঝেও ঐক্য খুঁজে বার করেন ও সবার ও সবার সঙ্গে মিলতে পারেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল কারণ হলো ধর্মের আসল রূপ, মানবতা, সর্বজনীনতা ত্যাগ সম্পর্কে ভ্রান্ত কারণ হলো ধর্মের আসল রূপ, মানবতা, সর্বজনীনতা ও ত্যাগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। নিজের ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা একসঙ্গে বিদ্যমান থাকা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

amarboi.org

তাই জাতীয় অগ্রগতির যুগে আমাদের শুধু তথাকথিত ধর্মপ্রাণ হলে চলবে না। (ধর্ম অবশ্যই মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন রূপ, যা সর্বযুগেইবহুমূল্য) আমাদেরকে আজ প্রাণধর্মী ও ধর্মপ্রাণ দুই-ই হতে হবে একসঙ্গে। বিচারবুদ্ধকে জাগ্রত করে আমাদের সমাজের জীবনবোধের উপর ভিত্তি করে এক প্রাণসঞ্চারী নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য গোরস্তান-মানসিকতা ও মোল্লাতন্ত্র বর্জন আমাদের প্রধান কর্তব্য।

ধর্ম ও রেনেসাঁ

ইসলামী জীবনদর্শন ও সংস্কৃতিতে যে জীবনবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা কখনই রেনেসাঁ বিরোধী হতে পারে না। প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা কখনো কখনো রেনেসাঁর সংকেত দেয়, তবে তা কিছুতেই রেনেসাঁর মূল্য বিচারের মানদন্ড নয়। কোন একটা জীবনদর্শনের নীতি ও মূল্যবোধ যদি প্রাণবন্ত, সজীব ও সংবেদশীল হয়, তবে তার মধ্যে চিন্তা, কার্য ও আনন্দের নব নব অভিযান নিছক অসম্ভব কষ্ট কল্পনা নয়। সাহিত্যও শিল্পকলার মারফত মানব মনের চিন্তা স্পন্দনের নব নব বিস্তৃতি শেষ পর্যন্ত যদি প্রকৃত রেনেসাঁ ও সমাজকল্যাণ আনতে চায়, তবে তার পেছনে একটা সুষ্ঠু জিনবোধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইতালীতে জীবনবোধের একান্ত অস্পষ্টতা ও ইংল্যান্ডে জীবনবোধের অযুত স্বীকৃতির ফলে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফল যে এই দুদেশে ভিন্নরকম হয়েছিল, তা সবঐতিহাসিকেরই জানা আছে। ইতিহাস একথাও প্রামাণ করেছে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর পেছনে রয়েছে ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ইসলাম ধর্ম নামে কথিত হলেও এ প্রেরণা কদাচিৎ অমূলক নয়। বুদ্ধিদীপ্ত, সর্বজনীন ও সংযত মানসিকতার মাধ্যমে প্রতিভার নব নব উন্মেষের নামই রেনেসাঁ। যার মধ্যে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সংগঠনী দৃষ্টি ও সার্থক বিবর্তন লুকানো থাকে। তবে সেই সংগঠন পরিবর্তন ও বিবর্তন শেষটায় সমাজকল্যাণে পৌছানো চাই ও মানবিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ

ইসলাম জীবনর্শনের সার্বজনীন মূলনীতির উপরে ইসলামী তমদ্দুন প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল্যবোধ এই তমদ্দুনের প্রাণ। সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সহস্র প্রেরণা রয়েছে এই সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলামী জীবনর্শনকে আল-কুরআনে বিশালাকার বৃক্ষের সংগে তুলনা করা হয়ছে। ধর্মের বাণী একটা বৃক্ষের মত, যার শিকড় থাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর শাখা প্রশাখা আসমানে মাথা উঁচু করে থাকে। (সূরা ইবারাহীম : ১৪,২৪) তৌহীদ (আল্লাহর একত্ব), মালিকিয়াত (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) ও খিলাফত (মানুষের প্রতিনিধিত্ব) এই তমদ্দুনের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ এক ও তিনিই একমাত্র উপাস্য ও তাঁর উপরে আর কেউ নেই, কোন শক্তি নেই।

তিনি শুধু মুসলিমের প্রভু নন-সমগ্র নিখিল বিশ্বেরই তিনি প্রভু। জাতি হিসেব কেবলমাত্র মুসলমানেরাই তাঁর অনুগ্রহ-প্রাপ্ত নন। সব জাতি এবং ব্যক্তিই তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত পেয়ে থাকেন। তবে কোন জাতি বা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর ঈমান, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, সততা, সাধুতা ও মানবকল্যাণের উপরই নির্ভর করে। প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি এ সেই হিসেবে সমান অধিকারের দাবীদার। সব মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই ও একই আইনের অধীন। এ বিষয়ে শাসক বা শাসিতের মধ্যে কোন তফাত নেই। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতার বালাই নেই। এই জীবনদর্শনের বস্তু আত্মার কোন বিরোধ ও স্বীকৃত হয়নি; উভয় দিকেই দেয়া হয়েছে সমান মনোযোগ। মানুষে মানুষে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় বিচারের

ভিত্তিতে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে জ্ঞান, কার্যক্ষমতা ও নৈতিক উৎকর্ষের উপর ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে সুষ্ঠু ও সুবিচারমূলক সমাজ গঠনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথাই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, রিবা বা সুদ এবং সর্ব প্রকারের অর্থনৈতিক শোষণ ঘোর পাপ ও মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক কল্যাণের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি) সীমার মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করা চলে। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য ইসলাম বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা বা যাকাতের বিধান দিয়েছে। ইসলাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যেতে জানিয়েছে উদাত্ত আহব্বান। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও নিরাপত্তা ইসলাম স্বীকার করে। এই অধিকার কারো ছিনিয়ে নেবার অধিকার নেই।

সালাত বা নবয়তের নীতি দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছে যে, দুনিয়ার সব জাতির ভেতরই রসূল (সা) এসেছেন ও হযরত মুহম্মাদ (সা) আল্লাহর শেষ রাসূল। এই নীতির দ্বারা মানব জাতির ঐক্য ও বুদ্ধিমত্তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামের মতে সত্য ও জ্ঞানের উপলবদ্ধিতে কোন জাতির একচ্ছত্র অধিকার নেই । মানব সংস্কৃতির ঐক্য পরস্পর নির্ভরশীল ও মানব মহিমার স্বীকৃতি রয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে এখানে উদার দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা, তার ভেতরে দেখি মানবতার জয়জয়কার। যদিও এই সাংস্কৃতিক বিচার বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন মুসলিম সমাজের সামাজিক দুর্গতি, অর্থনৈতিক অরাজকতা গোষ্ঠীগত অন্ধকার মাঝে আটকে গেছে, তবু মুসলমানগণ দু:খের নির্মম তৌহীদে ও রিসালাতের আশ্রয় নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন, শত বাধা-বিপত্তি জয় করতে পারেন। তৌহীদ ও রিসালতের নীতিকে বুঝতে পারলে মুসলিম মানুসের নিছক নেতিবাচক ভাবধারা ও অন্তর্মুখিতা দূর হয়ে যাবে ও ইসলামী জীবনদর্শনের মূল উদ্দেশ্য সুষ্ঠু সমাজ সংগঠনের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেলতে পারব। এ উপমহাদেশের মুসলিম বিজয়ের ইতাহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, বিজয়ীরা সবাই এক জাতির লোক নয়- কিন্তু তারা একই সূত্রে গ্রথিত; তারা সবাই মুসলিম, এই ছিল তাদের পরিচয়। তুর্কী, আফগান ও মুগল নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও ইসলামী জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির এক একটা বিশিষ্ট অংশরূপে নিজেদের মনে করতেন। তৌহীদ ও সাম্যনীতি এই সব জাতিকে কম-বেশী ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় এনেছিল। ইসলামী সংস্কৃতির একথা দাবী করে না যে, কেবলমাত্র এর মধ্যেই মানুষের মানুসিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দুনিয়ার সব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ইসলামী তমদ্দুনে সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার সার্থক অনুপ্রবেশ ইসলামের কাম্যও। এইজন্যই ইসলামে মৌলিক নীতি অক্ষুন্ন রেখে সামাজিক চাহিদা ও পরিবেশমাফিক নীতিকে (প্রিন্সিপালস্) বাস্তবে রূপায়িত করতে বলা হয়েছে। এর নাম ইজতিহাদ। ইসলামী জীবনদর্শনকে আধুনিক যুগে রূপায়ণের উপযোগী করে তুলতে হলেও আধুনিক মানুষকে ইসলামের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে যেমন একদিকে জ্ঞানের মারফত ইসলামের সামাজিক রূপায়ন প্রয়োজন,তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের মূল্যবোধ-অনুগ করে ঢেলে সাজাতে হবে। অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ বলেন যে, ভাগ্যগুণে খৃষ্টজন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে মিসরে মানব সভ্যতার পত্তন হয় ও সেখানে থেকে তা তাইগ্রীস নদের তীরে, বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে, চীনে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় সংস্কৃতি বিবর্তনের প্রত্যয় (ইভল্যুশনিষ্ট থিয়োরী) অপরদিকে অধ্যাপক টয়েনবি বলেন যে, অন্যান্য সংস্কৃতির সংগে সংযোগের ফলেই কোন একটা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। একে বলা হয় সংস্কৃতির সঞ্চারশীল প্রত্যয় (ডিফিউশনিষ্ট থিয়োরী)। রিসালাতের মারফত ইসলাম গৌণভাবে এই সঞ্চারী প্রত্যয়কেই সমর্থন করেছে।

আধুনিক দুনিয়ার সমগ্র মুসলিম জাতির একজন শাসক বা খলীফা ঘোষণা করলে বা সাধারণ মুসলিমের রোমান্টিক ঐক্যের (যার আংশিক প্রয়োজন কোন দিন ফুরিয়ে যাবে না) কথা প্রচার করলে কোন ফায়দা হবে না। দেশে-দেশে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সমাজনীতির দ্বিধানীন রূপায়ণের মারফত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর মুসলিমের সামাজিক (সমাজ ব্যবস্থাগত) ও আধ্যাত্মিক এই উভয়

amarboi.org

মিলনের সেতু রচনা করা সহজ হয়ে যাবে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন তথাকথিত রাজতন্ত্রগত মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে খিলাফতভিত্তিক গণতন্ত্রী অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সমঝোতা ও সত্যিকার মিলন অনেক দিক দিয়েই অসম্ভব ব্যাপার।

ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকে আমরা এই সত্যেরই ইঙ্গিত পাই। এখানে ঘটেছে বস্তু ও আত্মা, সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়। দুনিয়ার সব কাজেই মুসলিমের ইবাদাত, যদি তার ভেতরে জীবন সম্পর্কে সর্বাংগীন দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবকল্যাণ নিহিত থাকে। দুনিয়ার কাজ করা দুনিয়াদার হওয়া নয়- আল্লাহকে ভুলে থাকার নামই দুনিয়াদার হওয়া। সমগ্র প্রকৃতিতে রয়েছে সত্যের নিদর্শন। সেই শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে, আহরণ করতে হবে। কারণ এই বাস্তব জগতই পরকালের শস্য ক্ষেত্র। আকল বুদ্ধি, মুহব্বত (প্রেম) ও মারেফাতের (সাধনা) মাধ্যমে ফালাহ (সাফল্য) লাভ করাই ব্যাপক অর্থে ইবাদত ও ইসলামী তমদ্দুনের বাস্তব পন্থা। এমার্সনের মতে সংস্কৃতির যে বিশেষ গুণ সামাজিক সংযোগ ও আত্মগত নির্জনবাসের মধ্যে এক মাঝামাঝি পথ, তা ইসলামী সংস্কৃতিতে পুরোপুরি মেলে। সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির কারবার। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ জীবন, খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা, যৌন-জীবন, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প বাণিজ্য সম্পর্ক এবং এক মানবোচিত পরিকল্পনা এতে রয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক আর্দশের (গণন্ত্র ও সমাজতন্ত্র) চাইতে মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ ইসলামের নেই বললেই চলে (পাশ্চত্য দেশগুলোর রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও কমিউনিস্ট চীনের স্বৈরবাদী গণতন্ত্র)। ইসলামে শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে মতবিরোধ। ইসলামী জীবনদর্শনের কোন মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই দুটো দল গড়ে ওঠেনি। আর এই জীবনদর্শনের মৌলিক নীতি ও সমাজদর্শনের কোন অস্পষ্টতা নেই। সুদূর প্রসারী এক একটি দিককে আদি সত্তার প্রকাশের সমগ্র রূপ বলে মুসলমান মনে করেন না, তাই তাকে পূজা না করে করেন অনুশীলন। ইসলামী সংস্কৃতির এই সর্বমুখিনতার ফলে আরবদের মধ্যে ইসলামের প্রেরণায় শল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চার পরিপূর্ণতা ও স্মরণ একই যুগে সম্ভব হয়েছিল। করআন একখানা বিজ্ঞানের কেতাব নয়, বিজ্ঞানে সত্য প্রচার করা ও কুরআনের কাজ নয়। ইসলাম দিয়েছে বিজ্ঞানের প্রেরণা। সেই প্রেরণা সার্থক হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবে। মানুষের মত আদিসত্তা আল্লাহ কোন ব্যক্তি নন, তিনি সেই মহান শক্তি, যিনি একই সঙ্গে একদিকে সুদূরপ্রসারী (ট্রানসেনডেন্টাল) অপর দিকে অনুপ্রসারী (ইমানেন্ট)। তাই তাঁর থেকে ইসলামী জীবনদর্শনের দার্শনিক ভিত্তি ও সর্বাংগীন (নিছক বস্তুগত নয়) বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতর
জন্ম হয়।

ইসলামী সাহিত্য

সাহিত্য মানব হৃদয়ের প্রাণধর্ম। মানব মনের ভাবাবেগ, অনুভূতিও আশা-আকাঙ্খা সার্বজনীন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য বললে সাহিত্যের অপমান করা হয়, আর ইসলামকে করা হয় হেয়। প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাবের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য ও ইসলাম, এ দুটোকেই বোঝার ভুল। সাহিত্য তো সবই এক, তবু রুশ সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্য, আইরিশ সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য, ইহুদী সাহিত্য, হিন্দু সাহিত্য ইত্যাদি আছে। যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজী সাহিত্যখে ঐ নামে অভিহিত করেন, তা কি সাহিত্যের অবমাননা করা, না সাহিত্য সম্পর্কে সত্য ভাষণ। ইসলাম মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ করে শুধু ধর্মীয় কিতাব পাঠ করতে ভলেনি-দুনিয়ার সেরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতি মন্থন করতেই বারবার প্রেরণা দিয়েছে। জ্ঞান মুসলিমের হারানিধি। যে দেশেরই বা জাতিরই হোক না কেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকতদের উপেক্ষা করা চলবে না। আবার অন্য সাহিত্যকে তাড়িয়ে দেবারও কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস পারস্পরিক নির্ভরতার ইতিহাস। তবু সাধারণভাবে, ইসলামী সাহিত্য বলে একটা জিনিস আছে ও এক এক দেশের ভাষার মাধ্যমে এর বৈচিত্র প্রকাশ ও বিকাশের সম্ভবনা রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য বলতে বুঝতে হবে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশমূলক সাহিত্য। এই সাহিত্য আবার দুপর্যায়ের ক. ইসলামী জীবনদর্শন

সম্পর্কীয় ধর্মীয় সাহিত্য; খ. ব্যাপক অর্থে প্রথমত বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের মারফত (উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ) এই জীবনদর্শনের বিচিত্র বিকাশ। দ্বিতীয়ত মুসলমানের জীবনের ছবি যে সাহিত্য রূপ পরিগ্রহ করে। এই জীবন অবশ্য কেবলমাত্র মুসলমানের জীবন নয়-মুসলমানের সঙ্গে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের সম্পর্ক এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই সম্পর্ক নিয়ে মুসলমানের জীবন যে সাহিত্যে প্রতিভাত হয়, তাকেও ইসলামী বলা যেতে পারে। এর মধ্যেও থাকবে নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের অযুত সম্ভার। তৃতীয়ত মুসলমানদের লেখা সাহিত্য। কিন্তু যেহেতু মুসলামানের লেখা হলেই তা ইসলামী জীবনবোধ ও মুসলিম জীবনধারার বিকাশ নাও হতে পারে, সেই কারণে প্রথমত ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্য ও ব্যাপক অর্থে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশ ও মুসলিম জীবনের ছবি যে সাহিত্য থাকবে, সেই সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যের মানদন্ড হিসেবে ধরতে হবে। অবশ্য এই দিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমান লিখলেই তা ইসলামী সাহিত্য হয় না। কোন ক্ষেত্রে হিন্দু বা খৃষ্টান লেখকের হাত দিয়ে ইসলামী সাহিত্য বের হতে পারে। আবার উর্দু ভাষায় লেখা হলেই তা ইসলামী সাহিত্য হয় না। সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতে ইসলামী সাহিত্যের বিকাশের বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

ইসলামী সাহিত্যের ওপর জোর দেওয়া অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যাঁরা এই সাহিত্যের স্বীকৃতি চাইছেন, তাঁরা বাইরের দুনিয়ার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সংযোগ রাখবেন না, প্রতিবেশীর খবর নেবেন না। বাইরের সংযোগেই ত হয় প্রাণশক্তির বিচিত্র উদ্ভোদন। ইসলামী জীবনদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ও ভাষার সাহিত্য মন্থর ও উপভোগ করা ও বিচিত্র সাহিত্য রচনা করাতে কোন বাধাই নেই। অন্য সাহিত্যের রস স্বাদ করা, মন দেয়া-নেয়ার ব্যায়াম ইসলামী সংস্কৃতি চেতনার এলাকার মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া আমাদের সাহিত ও সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক সম্ভবনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে আদান-প্রদানের ওপরই নির্ভর করে। তবে রসাস্বাদ করা আর কোন একটি সাহিত্যের অন্তর্নির্হিত নীতিবোধ জীবনদর্শন হিসেবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা একেবারেই পৃথক ব্যাপার।

একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, লব্ধ জ্ঞানকে নিজস্ব জীবনবোধ থেকে বিছিন্ন করলে সার্থক সৃষ্টি হয় না। সেইজন্য ইসলামী সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি সাহিত্যের সম্যক স্বীকৃতি নিছক অমূলক আত্মবদ্ধতা নয়। এর দ্বারা অবশ্য এ বোঝাতে চাই যে, পুঁথি সাহিত্যের হারাধন উদ্ধার করবেই জাতীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত হবে। কারণ পুঁথি সাহিত্য বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের এক দিক মাত্র। তবে সেক্সপীয়র যদি ইংরাজী ভাষা ও খৃষ্টান ঐতিহ্য বাদ দিয়ে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে লিখতে শুরু করতেন, তা হতো নিতান্ত অস্বাভাবিক। তাই বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অস্বাভাবিকতা, শূন্যতা, হীনমান্যতা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়া হয় ও আমাদের স্বকীয় জীবনবোধের স্বাভাবিক স্পূরণের দিকে সৃষ্টি নিবন্ধ করা হয় মাত্র। সাহিত্যিক কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য বা নীতিবাক্য প্রচার করার জন্য সাহিত্য রচনা করেন না। সাহিত্য লোকশিক্ষার বিভিন্ন উপাদান থাকলেও তার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রস সৃষ্টি করা। তবে জীবনের সমগ্র বিষয় কেবলমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের কথা সাহিত্যের বিষয়ভূত করা চলে না। যে সমস্ত বিষয় মানবমনের গভীরে লুকায়িত আছে, যা সমস্ত মানবতার মূল ও যার মৌলিক ও একক সার্থকতা আছে, তার মধ্যে দিয়ে মানবের স্বরূপ প্রকাশ করা সাহিত্যিকের লক্ষ্য।

তবে সাধারণভাবে সাহিত্যের মৌলিক সার্থকতা নির্ধারণের নিজস্ব জীবনবোধের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। এ কথা স্বীকার করার অর্থ অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যকে ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ করা নয়, ইসলামের বিপন্নবাদের দোহাই নয়, অথবা হিন্দু সাহিত্য ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। মানবের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখেও ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত স্বাতন্ত্র প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাহিত্যকে তাই শুধু রম্য ও রসোত্তীর্ণ হলেই চলে না, তাকে মানবতাবোধোত্তীর্ণও হওয়া চাই। জীবনের সব ছবিই সাহিত্য পাংক্তেয় নয়। যে আলেখ্য রূপে, রসে, গুণে মধুর মানবজীবনে সত্য ও কল্যাণকর, কেবলমাত্র তা-ই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। দেশ,

সমাজ,কাল এই সব আপেক্ষিকতাকে লঙ্ঘন করে সকল মানব সমাজের কতকগুলো নীতি আছে, যা রসোত্তীর্ণতার ছোঁয়ায় অপরূপতা লাভ করে। উঁচু দরের সাহিত্য অসুন্দর ও অকল্যাণকর হতে পারে না। দুর্নীতি প্রচার রসোত্তীর্ণ হলেও তা উচ্চ স্তরের সাহিত্য নয়। সাহিত্য জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জীবনকে মহিমান্বিত করে। সাহিত্য যদি মানবতার অপমান, নৃশংসতার উদ্রেক বা হিংসার প্রশ্রয় থাকে, তবে তা রসোত্তীর্ণ হলেও বিকৃতমনা ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ভাল লাগে না। আবার সাহিত্য যদি কেবলমাত্র আদেশ-উপদেশ-ভারাক্রান্ত ও তাকে রসবোধ না থাকে, তবে তা সাহিত্যের পর্যায়ের উঠবে না। ইকবালের ওঠ, দুনিয়ার গরীব-ভূখারে জাগিয়ে দাও, রবীন্দ্রনাথের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, মানবতা মূর্ত প্রকাশ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের গানগুলো ভালো লাগে। অবশ্য এক এক সংস্কৃতির আওতায় এই মানবতাবোধ ভিন্ন ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। বর্তমান যুগে নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্থির ধ্যান-ধারণার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এজন্য সাহিত্যের সারাংশকে জীবনে গ্রহণ করতে হলে নিজ-নিজ জীবনবোধের মানদন্ডে বিচার করে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা শুধু স্বাভাবিক নয়, বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সম্পর্কে টি. এস. ইলিয়ন তাঁর Religion and Literature শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : We shall certainly continue to read the best of its Kind (literature) of what our time provides, but we must tirelessly criticize it according to our own principals. The greatness of literature can not be determined solely by literary standards through we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standards.

সাহিত্যের সাধনায় ইসলামী সংস্কৃতির বিশ্বমূখীতা অব্যাহত রেখে একে নব নব বৈচিত্রে প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্যের আকর্ষনী ক্ষমতা রসাস্বাদে ও সমাজকল্যাণে ব্যয়িত হবে। তাই ইসলামী সাহিত্য স্বীকৃতর স্পৃহা ইসলামের মারফত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মানবতা প্রকাশেরই বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র। এদিক দিয়ে দেখলে সাহিত্য তিনটি স্তর আছে- ১. রসবান সাহিত্য, ২. রসবান ও মানবতা প্রকাশী সাহিত্য ও ৩. নিজস্ব জীবন বোধের মারফত মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য। স্বার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে এই তৃতীয় স্তরের মাপকাঠিতে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের তথাকথিত খোলস ও সাফাই বাদ দিয়ে ধর্মের সারাংশটুকু গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় লেবেল দেখলে আমরা যেন তাকে গ্রহণ না করি ও প্রকৃত ধর্মীয় বলে মনে না করি বা আকস্মিক ভাব, ধর্ম বা জীবনাদর্শকে আমাদের বিবেচনা এলাকার বাইরে না রাখি। আনন্দদানের সঙ্গে সাহিত্যের শেষ উদ্দেশ্য যে মানবকল্যাণ, তা যেন আমরা বিস্তৃত না হই। আর অন্যান্য সাহিত্যের শিল্প সৌষ্ঠব ও ছন্দ-বৈচিত্র গ্রহণ করতেও আমাদের যেন কোন আপত্তি না থাকে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি এবং মুসলমান

মুসলিম আমলের পূর্বে বংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন নযীর পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকরা বাংলার মৌলিক ও কথ্য ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতেন ও ধর্ম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মন্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে সেই বৌদ্ধ-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলেও ইসলামের তৌহিদ ও সাম্যনীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এই বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ। এই ভাষা হিন্দু-মুসলমানের ভেতর সমানে প্রচলিত ছিল। দলিল-পত্রাদিতে এর স্পষ্ট নযীর রয়েছে। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে মুজাফফর শাহ ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সুযোগে হাবশী দাসগণ বিদ্রোহ করে। তখন বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে বিচক্ষণ ও মানব প্রেমের চরিত্রবান হোসেন শাহকে (১৪৯৩-১৫১৯) গৌড়ের আধিপতি নির্বাচিত করলো। তিনি মগদেরকে পরাস্ত করেন ও তাঁর আমলেই কামরূপ গৌড়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তাঁর

করতলগত ছিল। হোসেন শাহের হৃদয় ছিল উদার, সরল ও একাত্মবোধদীপ্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের প্রবর্তন করলেন। তাঁর পূর্বে সংস্কৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় তরজমা হয়নি। তাঁর সভাতেই বাংলা কাব্যের গোড়াপত্তন হলো। তিনি প্রথম বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রবর্তন করলেন। ফারসী ভাষার পারদর্শী হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে চললেন। এইভাবে এক মহানুভব মুসলমান শাসনকর্তার মহানুভবতায় ও ইসলামের তৌহীদে, সামাজিক সাম্য ও মানবিক ঐক্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার জন্ম হলো। হোসেন শাহের প্রেরণায় বেদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুদিত হলো। এই সময়ের অনুবাদক ও সাইহিকদের মধ্যে মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁভাগবতের অনুবাদ), গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ), বিজয়গুপ্ত (পদ্মাপূরাণ), কবীন্দ্র পরমেশ্বর (পরাগলী মহাভারত) ও শীকর নন্দীর (মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসা মঙ্গল, ভারত পঞ্চালী, এই সব গ্রন্থও এই আমলে রচিত হয়। উত্তর ভারতের মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান যেমন উর্দু ভাষা, তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান হলো বাংলা ভাষা। এইভাবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণবিকাশে মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করলেন। শাহ মুহম্মাদ সগীর ও আলাওল বাঙালী সাহিত্যের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। হোসেন শাহের জীবন বাংলা সাহিত্যের স্ফুরণ অমর হয়ে রয়েছে। অবশ্য এই আমলের পূর্বেও মুসলমানদের লেখা বাংলা পুস্তক পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানের হাতে যে বিরাট পুঁথিসাহিত্য গড়ে উঠলো, তা বহুলাংশে আত্মরক্ষামূলক। বৈষ্ণবাবাদের প্রভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তার মধ্যে স্বতস্ফূর্ত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন এবং পলাশীর যুদ্ধ কেবল বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক পতন আনেনি, তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়ও এরই সঙ্গে এসে পড়লো। মুসলামনের এ পরাজয় হিন্দুরা সাদরে বরণ করে নিয়েছে ও সন্তুষ্ঠচিত্তে বৃটিশের শাসন মেনে নিয়েছে। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা তারা খুঁজে পেলো বৃটিশের শাসনে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত নীতির ফলে চাকরীর ক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম হয়ে গেল। এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানের অস্তিত্ব মুছে গেল। ফরাসী ভাষা ও মুসলিম আইনের স্থানে ইংরেজী ভাষা ও আইন রাষ্ট্রীয় ভাষা ও আইন হওয়ায় মুসলমানগণ লজ্জায়, ক্ষোভে, দু:খে সরে দাঁড়ালেন। অবশ্য শাসনকার্যে সুবিধার জন্য কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে কিছুদিন তথাকথিত মৌলভী তৈরীর মহড়া চললো। তবে ইসলামের প্রাণধমৃ জীবনর্শনের কোন শিক্ষা সেখানে ছিল না। আয়ম-লাখেরাজ বাজেয়াফত করে (১৭৯৭-১৮২৮) সেখানে তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন করা হলো। পলাশী পরবর্তী যুগের মুসলিম অসহযোগের সুযোগ হিন্দুরা খুব ভালভাবেই গ্রহণ করলো, আর মুসলিমেরা ডুবে গেল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নৈরাশ্যের অন্ধকারে।

অতপর বাংলা ভাষার বিকাশও মুসলামনের হাত থেকে সরে গেল। এর স্থান দখল করলো হিন্দুঘেষা খ্রীষ্টান মিশনারী ও হিন্দু সাহিত্যিকগণ। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারী ও হিন্দু সাহিত্যিকগণ। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারী কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ড খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের তাগিদে যে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করলেন, তাতে হিন্দদের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একচ্ছত্র হিন্দুযুগ শুরু হলো। এলো হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। হিন্দুত্ব ও বাঙালিত্ব এক জিনিস হয়ে দাঁড়ালো। হিন্দু বাংলা সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্য বলে চালানো হলো বহুদিন। ফলে আদি থেকে বাংলা সাহিত্যের যে একটা মুসলিম ধারা ছিল, তা বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেল। বাঙঅলীর জীবন বলতে হিন্দু বাঙালীর জীবনই বোঝাতে হতো। বাংলাদেশের মুসলমানও যে বাঙালী, একথা সবাই এক রকম ভুলেই গেল। মুসলমান কথাটি বাঙালী হিন্দুর কাছে অবাঙালী বলে ঠেকাতো। আমাকে কলকাতায় এক হিন্দু ভ্রদলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি মুসলমান না বাঙালী? আমি জওয়াবে বলেছিলাম, আমি বাঙালী মুসলমান।

বাংলা ভাষা হিন্দু ও মুসলমানের কাছে ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রীয় জীবন এক হলেও যে সাংস্কৃতিক জীবন আলাদা হতে পারে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুঁথি-সাহিত্য থেকে

amarboi.org

মুসলিম জনগণ অফুরন্ত প্রেরণা পেয়েছে কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে বাংলা ভাষার জনক মুসলমানের নিকট থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দূরে সরে গেছে। এই বিবর্তন হিন্দু-বৃটিশ আঁতাতের অনিবার্য ফল। ভারতচন্দ্র ও কবি কঙ্কনের মধ্যে যে ভাষা দেখতে পাই, তাতে মুসলিম প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। বর্তমানকালে জনসাদারণের কাছে অপ্রচলিত কৃত্রিম ভাষাই হয়েছে সাহিত্যের বাহন। আর সে যুগে প্রচলিত ভাষাই সাহিত্যের ভাষা।

ইসলামী সংস্কৃতি

মুসলিম অসহযোগের অবসানে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আলীগড় আন্দোলনের মারফথ ইংরেজী শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মুসলমানের সহযোগে ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসে যোগদান করে স্বীয় সত্তা বজায় রেখে সৈয়দ আহমদ বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। পরাজয়ের যুগেও (১৭৫৭-১৯০৫) ভারতীয় মুসলমান তাদের স্বাতন্ত্র হারায়নি। ১৮৩৩ সন থেকে ১৭৬৮ সন পর্যন্ত চললো মুসলিমের হতাশার যুগ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসে হিন্দী ও দেবনাগরী সম্মেলন হয়। এতে হিন্দীকে যুক্ত প্রদেশের সরকারী ভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। অতঃপর মুসলমানেরা রয়েল কমিশন অব এজুকেশন এর কাছে উর্দুর স্বপক্ষে এক স্মারকলিপি পেশ করেন (১৮৮২)। ১৮৯৮ সনে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর এই কাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়া। ১৯০০ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রাদেশিক গভর্নরের ঘোষণার দেবনাগরী সরকারী দফতরে গৃহীত হয়। এই সময়ে নওয়াব মুহসিন-উল-মূলক আলীগড়ে এক প্রতিবাদে সভা আহবান করেন। সরকারের নিকট এক স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। নওয়াব ভিকার-উল-মূলককে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দেন। লক্ষ্মৌতে একটি উর্দু রক্ষা সমিতিও গঠিত হয় (১৯০০ সাল ১৮ই আগষ্ট)। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ছাড়া মুসলিম অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয় বিবেচনায় ১৯০১ সালে বিভিন্ন স্থানের মুসলমান মিলিত হয়ে মুসলিমের রাজনৈতিক, সামাজিক সমিতি গঠিত হয়। এইভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মুসলিম রেনেসাঁর প্রথম যুগের সূত্রপাত হলো। অত:পর সিমলা ডেপুটেশনের মারফত মুসলমানের তরফ থেকে দাবী-দাওয়া পেশ করা হয় এর অনেক পূর্বে (১৮৯৩) গো-রক্ষা সমিতি ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে। হিন্দু পূনর্জম্মবাদ বা রিভাইভালিজম স্বতন্ত্র মুসলিম চেতনার জন্ম দেয়।

অন্যদিকে ইসলামের সংস্পর্শে অনেক আগে থেকেই হিন্দু মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। রাজপুতনা ও বিজয়নগরে ধর্মবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইসলামের প্রভাবে হিন্দু সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী হতে থাকে। সুফীবাদের প্রভাবে হিন্দু সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী হতে থাকে। সুফীবাদের প্রভাবে হিন্দু বৈষ্ণববাদের জন্ম হয়। নানক, কবীর, রামানন্দ, শ্রী চৈতন্য, জয়দেব, মীরবাঈ, নামদেব (মহারাষ্ট্র), জ্ঞানেশ্বর (গুজরাট) প্রমুখ সাধকের আবির্ভাব হয়। গীতার ভক্তিবাদ ইসলামের তৌহীদের স্পর্শে জনপ্রিয় হয় ও দেশজ ভাষাগুলো নবজীবন লাভ করে । শ্রী শংকরাচার্যের নৈর্ব্যক্তিক দর্শন পরিত্যক্ত হয় ও তার স্থানে ভক্তিবাদ হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের প্রভাবে বাঙালী হিন্দর দার্শনিক চিন্তার প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের প্রভাবে বাঙালী হিন্দুর আত্মিক উন্নতি হয়, চিন্তাধারা মানবতা দ্বারা সজীব ও সমৃদ্ধ হয় আর চিন্তারও গভীর এবং বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক দিকে হিন্দুরা যথেষ্ট লাভবান হন। সমাজে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র পাকাপাকিভাবে শিকড় গজিয়ে বসে। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিম-সাহিত্য হিন্দু ঐতিহ্যের গুণকীর্তণ হিন্দু সমাজ ইসলামের প্রভাব সামলে নিয়ে আত্মস্থ করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অপরদিকে অনাত্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতিও পর্যুদস্ত হয়।

বিশ্ব সাহিত্য আজ অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাংলা ভাষার কিনারায় তার ঢেউ এসে লেগেছে। ফলে মূল্যবোধের দিক থেকে এক বিরাট শূন্যতা আমাদের সাহিত্যকে পেয়ে বসেছে। বাংলা বিভাগের ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য এই শূন্যতা আরও মারাত্মক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ইউরোপ এতদিন

ধর্মকে যাজকতন্ত্র মনে করে বসেছিল। ক্রমে ক্রমে তার সে ভুল ভেঙ্গে যাচ্ছে। ইউরোপের শিক্ষার্থীরা ও সাহিত্যিকেরা লিখেছেন প্রচুর। কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুবকদের প্রগতিমূখী গতিশীলতা থেমে গেছে, শ্লোগানকেই তারা জীবনের চরম বাণী ঠাউরেছে। লন্ডন ইয়ার বুক অব এজুকেশন থেকে আমরা এ কথার ইঙ্গিত পাই।

এই ইয়ার বুকের (Education and the social crisis in Europe) শীর্ষক এক পুস্তিকা থেকে আমরা জানতে পারি : Mere appeal to the intllect has already proved wanting. The beginning of a ture intellectual discipline and of genuine religious emotions and experience has become manifest. Even when the thread of tradition has been broken, the actual trend of education is in the opposite direction. The spirit of revolt is disappearing whose place is being taken by self discipline.

আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ সংগঠনের করতে অগ্রসর হই, তবে সে আগে চলার ধাপ্পা আমাদেরকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তা হবে প্রগতির নামে বিকৃতি ও পরের ধরে পোদ্দারি। আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির সহজ স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে আমাদের সাহিত্যিক শূন্যতা, দাসত্ব ও হীনমন্যতার অবসান। সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহশীলতা, ধৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদেরকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি

মুসলমানের কাছে আর্দশ ইসলাম ও মানবতা, দেশজ আদর্শ ও নীতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম আদর্শ মানবতার আওতায় দেশকে ভালবাসাতেই শিখিয়েছে। নিজের দেশকে ঘৃণা বা দেশের জনসাধারণকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে কোনদিনই বলেনি। খাঁটি মুসলমানের কাছে (এবং সব ধার্মিকের কাছে) তাঁর আদর্শগত সংহতি তাঁদের দেশের সীমানার চাইতে বড়। কারণ সেই আদর্শ জাতিগত অন্ধতা দূর করে সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। ইসলামী জীবনদর্শন সম্বন্ধে গভীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আদর্শ মুসলমানকে তার নিজের দেশের সমস্যাকে অবহেলা করে অলীক কল্পনা করতে বলেনি। কিন্তু ইসলামের মহত্ব, মানবতা ও সুবিচারের আদর্শ দেশজ, পার্থক্য, সংকীর্ণতা চরমবাদের উর্দ্ধে। দেশকে বা দেশত্মবোধকে ইসলাম কোনদিন অস্বীকার করেনি বা নষ্ট করে দিতেও চায়নি। বিভিন্ন দেশ,জাতি বর্ণ ও ভাষা ইসলাম স্বীকার করেছে। কিন্তু দেশ বা জাতির মাধ্যমে উগ্র বা চরম নীতিবোধ (দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে শ্রেয়) আমাদের দেশ যা করে সব ভাল) কখনো স্বীকার করেনি। মুসলিম বাদশাহদের সঙ্গে জড়িত না থেকে ইসলাম যদি কেবলমাত্র মুসলিম দরবেশসুফীদের শান্তিপূর্ণ প্রচারের মারফত রূপায়িত হতো, তবে ইসলামের মানবিক দিকটা বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের গভীরতর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করতে পারতো।

মুসলমানের মন যে অনেকখানি আরব-অভিমুখী, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মুসলামানের আর্দশ ইসলাম-অভিমূখী। গভীর নৈরাশ্যের যুগে আরবমূখিনতা মুসলিম চিন্তাধারায় বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে ও এর থেকে মুসলমানেরা পেয়েছেন গভীর প্রেরণা। তবে আত্মস্থ হয়ে মুসলমানেরা যদি ইসলামের মৌলিক জীবনবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন, তবে দেখবেন যে, ইসলাম দেশের সমস্যাকে অবহেলা করতে কোনদিনই বলেনি, তাই নৈরাশ্যজনক ও দু:খবাদী নেতিবাচক ভাবধারা পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে বাস করে একদিকে এখানকার প্রকৃতি, মাঠ, নদী, বন, নারকেল, সুপারী,কোকিল, শালিক, ডাহুক, দেশের সুখ-দু:খ ও অন্যদিকে উট, খেজুর, মরুদ্যান, লু-হাওয়া, আখরোট, বাদাম খুবানী আমাদের মনে সমান ভাবে দোলা দেবে বাস্তব জীবনকে অবহেলা করা হবে ও ইসলামকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা হবে না।

আবার মরুর লু-হাওয়া থেকে আমাদের মনকে একেবারে সরিয়ে রাখলে মুসলমানদের মানসিক ঐতিহ্যকে মারাত্মকভাবে অস্বীকার করা হবে। ইসলামের ও মানবতার আওতায় চিরজাগ্রত মন দিয়ে আজ আনন্দ, প্রেম ও কল্যাণের উপলবদ্ধি চাই-ইসলামের ভিত্তিতে গতিশীল সংগঠন চাই। নিছক কৃত্রিম পুনুরজ্জীবনে (রিভাইভালিজম) বিশেষ কোন পয়দা হবে না। মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা তথা কথিত ধর্মীয় লেবেলের প্রচারের মারফতেই আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা নয়। ইসলামের সমাজনীতির সঙ্গেই বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আমরা যখন ইসলামী সমাজের কথা বলি, তখন আমরা অতীতে ফিরে যাই না, ইসলামের মূল আদর্শ ও বিচিত্র সম্ভবনার কথা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু। রাসূলুল্লাহ (সা) ও খেলাফায়ে রাশেদা থেকে আমরা অফুরন্ত প্রেরণা পাই; পেছন দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি, কিন্তু পিছু হটি না। সামনের দিকেই কেবল আমাদের পথ চলা। আকাশচারী দিব্যদৃষ্টি ও বস্তুনিষ্ঠ অনুভূতি-এ দুটোকে এক করে আজ অগ্রসর হতে হবে। জীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরতার মধ্যে প্রাচুর্য খুঁজে বের করতে হবে। জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য বাসনা সৃষ্টির প্রয়োজন, আর এই পরিপূর্ণতা আছে জীবনবোধের সঙ্গে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের তুলনায় ও সামঞ্জস্য বিধানে। বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি দেশকে কোনদিনই বাদ দেয়নি। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখতে পাই, ইসলামের প্রভাবেই বাংলার প্রাণ-মনকে জনগণের জীবনের দিকে ও লৌকিকতার দিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। মুসলমানেরাই বাংলা ভাষার জনক। অবশ্য নানা কারণে এ ভাষা মুসলমানের হাত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এই কারণে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদে বিশ্বাসী (ইসলামী জীবনদর্শনে নয়) মুসলমানেরা বলে যে, বাঙালী মুসলমান এখনো খাঁটি মুসলমান হতে পারিনি।

কোন একটি দেশে বাস করে সে দেশের রাজনৈতিক জাতীয়তা গ্রহণ করতে ইসলাম কোনদিনই বাধা দেয়নি। ইসলাম জাতীয়তা ও দেশাত্নবোধ তখনই বাদ দিতে চেয়েছে, যখন তার জাতীয়তা ও গোষ্ঠীপ্রেম মানবতা, ন্যায়, ইনসাফ ও ইসলামকে উল্লঙ্ঘন করে গেছে। নিজের ভাষার মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান লাভ করতে ও কুরআন শরীফ পড়তে কোন বাধাই নেই (অবশ্য মুসলিমের ঐক্য-সাধনে আরবী ভাষার অবদান স্বীকার করতেই হবে)। বহুবিবাহ বা পোশাকের শালীনতাকে অবরোধে পর্যবেসিত করার জন্য ইসলাম দায়ী নয়; মোল্লাতন্ত্র ইসলাম স্বীকার করেনি বা ফেজ মাথায় দিলে কেবল মুসলমান হয়, এটাও ইসলামের নীতি নয়। তবে ইসলামী আদর্শের উপর জোর দেবার অর্থ হলো ; ইসলামের চোখে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে সততা ও সামাজিক সুবিচারের শ্রেষ্ঠত্বই অধিক মূল্যবান। প্রকৃত ধর্মীয় রাষ্ট্র (খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দ বা ইসলামী যাই হোক না কেন) আর সম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশে রাজনৈতিক জাতিয়তাকে একেবারে বাদ দেবে না। কিন্তু এ দেশের মানুষ মানবতা ও ইসলামী আদর্শের উপর দিয়ে দেশজ কুসংস্কার, গোষ্ঠীবাদ, অন্ধতা ও চরমবাদে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম রাজনৈতিক জাতিত্ব ও আদর্শগত জাতিত্ব-উভয়ই স্বীকার করে। রাজনৈতিক জাতিত্ব স্বীকার না করলে দেশের সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান করা যায় না। আবার আদর্শগত জাতিত্ব স্বীকার না করলে দেশজ সংকীর্ণতার উর্দ্ধে মানবতার ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাটির বাঁধন ইসলাম অস্বীকার করে না। প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র রাজনৈতিক সংগঠনে দেশজ, আর জাতীয় ও আদর্শিক ব্যাপারে মানবতামূখী সর্বজনীন। আর সব দেশের মুসলমানের মধ্যে যে সংহতি ও একত্মবোধ রয়েছে, তা এই মানবতাসঞ্জাত আদর্শিক ঐক্যের ফলেই জন্মলাভ করে। মানবিক পরিসীমার মধ্যে জাতীয়তার স্বীকৃতি ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী নয়। দেশকে, দেশের লোককে ভালবাসতে ইসলামে কোন বাধাই নেই। কিন্তু তথাকথিত দেশতন্ত্রের যাঁতাকলে মানবতার অপমান, দেশে নামে বিধর্মী বা বিজাতীয়ের অপমান ইসলামে বরদাশত করা হয়নি। আর এই হিসাবে দেশকে বড় করার বিরুদ্ধে ইসলামের অভিযান, তাতে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই। তবে এ কথা সত্য যে, মুসলিম পরাজয়ের যুগে মুসলিম মানসে বায়বীয় আরবমূখিনতা ভিড় করেছে, আদর্শগত জাতিত্ব ও মানবতার স্থানে অন্ধ গোষ্ঠীবাদ অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে রিসালাত এর নীতি থাকায় প্রত্যেক সত্যিকার মুসলিম বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব জাতের ভিতরেই আল্লাহর নবী এসেছেন ও তৌহীদ, মানব ঐক্য ও ন্যায়বিচারমূলক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিতও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই নবীদের অনুসারী জাতিগুলো মূলত ইসলামের অনুসারী হওয়ায় আদতে সবারই সংস্কৃতি সর্বজননীতার উপরে

স্থাপিত ছিল। তাই ইসলামী জীবনবোধ ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র উগ্র দেশাত্মবোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানবতা ও মাখলুকাতের কল্যাণের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

বাঙালী মুসলিমের সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত ও তৌহীদসঞ্জাত। এর কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। হযরত (সা) এর জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবার উপকূলে চেরুমলজেরুমল নামে হিন্দু রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও শারাফ বিন মালিক নামক একজন আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। সিংহলের রাজাও ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ইসলামের ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

৭১১ সনে মুহম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলজীর আগমনের অনেক আগেই আরব বণীকদের দ্বারা ইসলাম চট্টগ্রামে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। Richard Symonds এর The Making of Pakistan এ অধ্যাপক আহমদ আলীর প্রবন্ধে (১৯৭পৃষ্ঠা) রয়েছে : The culture that developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of the Arab voyages and traders had left a permanent impress upon the area. Islam therefore took out very early in this soil.

বাঙালী মুসলমানেরা ইরানী ও তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি গড়তে চেয়েছিল। সাম্যধর্মী আরব বণীকেরা পাল রাজাদের আমলে বাংলার কূলে ব্যবসা করতেন। বিখ্যাত আরব সওদাগর আল হোসায়নি জাহাজ দিয়ে নসরত শাহকে মগদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। উদারমনা মুসলিমদের আগমনকে বৌদ্ধরা মুবারকবাদ জানান। বৌদ্ধ দোঁহার মধ্যে মুসলিম তমদ্দুনের অনেক মাল-মসলা পাওয়া যায়। এর থেকে নিশ্চিত প্রমাণ মেলে যে, বাঙালী ও রাজসিকতা ও গোষ্ঠীগত অন্ধতামূক্ত। এই সংস্কৃতি মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশী, শক্তিধর্মী ও বাস্তব প্রাণশীল।

হযরত উমর (রা) এর খিলাফতকালে (খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মামুদ ও হযরত মুহামিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামেদউদ্দীন, হযরত হুসেন উদ্দীন হযরত মুর্তাজা,হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবূ তালীব। এইরূপ পাঁচটি দল পরপর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র বই-কাতাবও থাকতো না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার-পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এ দেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক সত্যিকার মুসলিম তৈরী করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের বলা হত আবিদ। এরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রণভাই-এর উপকূলে এক জাহাজডুবী হয়। এই ডুবির পর যাঁদের প্রাণ রক্ষা পায়, তাঁদেরকে আরাকান রাজ্যের নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজা এদের নিকট ইসলাম ধর্মের বিবরণ শুনে মুদ্ধ হন ও কয়েকটি পল্লীতে তাঁদের বসবাসের অনুমতি দেন। সপ্তম, নবম ও চতুর্দশ শতাব্দীতে অনেক মুসলিম ওলী বাংলায় আসেন। বাবা আদম শহীদ শাহ সুলতান, মহীসওয়ার ও বায়েজীদ বোস্তামীর নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শেখ জালালুদ্দিন তাবিজী, শেখ বদর আলম ও জালালুদ্দিনের নাম করা যেতে পারে। চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু দরবেশে বাংলাদেশে এসেছিলেন। আখি সিরাজউদ্দীন, আলাওল হক ও

amarboi.org

হযরত নূর কুতুবুল আলমের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। খানজাহান (বাগেরহাট), খান গাজী (ত্রিবেণী) ও শাহ ইসমাইল গাজী একাধারে দরবেশ ও সেনানায়ক ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের এই সব ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান থাকার ফলে বাংলার মুসলিম সংস্কৃতিও সংকীর্ণতা দোষমুক্ত। এদিক দিয়ে দেখলে আলীগড়ে ও লক্ষ্ণৌর তমদ্দুন থেকে এর পার্থক্য বিস্তর। এই সংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ ও খুলাফায়ে রাশেদা ও তুর্কী বীরদের গাঁথা এর মর্মবানী। রাষ্ট্রে তুর্কী ও মুগল প্রভাব থাকায় যদিও বাংলার সমাজব্যবস্থা ইসলামী রূপে গড়ে ওঠেনি, তবু সমগ্র বাংলাদেশে ও বিশেষ করে পূর্ববংগে তৌহীদবাদ আগুণের মত ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালী মুসলিম তাই একান্তভাবে গণনির্ভর।

জীবনবোধ ও সাহিত্য

আমরা যদি চারদিকে তাকিয়ে দেখি,তবে দেখব যে, আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্নই রয়েছে। কিন্তু সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি নিতান্ত স্বল্প পরিকলক্ষিত হয়। আমরা যদি এই কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি, তবে আশা করা যায়, সাহিত্যের এই নিরাশ্রয়, নিরাবলম্বন এতিম অবস্থা ঘুচে যাবে। মূল্যবোধের ব্যাপারে পরাশ্রয়ী না হয়ে নিজস্ব জীবনবোধের উপর ভিত্তি করে, ভৌগলিক পরিবেশ ও ইতিহাসকে স্বীকার করে সংগঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করা নিছক পুনরুজ্জীবনের (revivalism) ব্যাপার নয়, যদি তার মধ্যে সুষ্ঠু সমাজচেতনা,মূল্যবোধ ও সাহিত্যিক প্রতিশ্রুতি থাকে। অনেকে বলেন, আমাদের সাহিত্য ও আমাদের ভিত্তি যে ইসলামী হবে, তা তো স্বত:সিদ্ধ ব্যাপার, তা নিয়ে এত বকা-বিতন্ডা কেন? কথাটা সরল মনের পরিচায়ক। কিন্তু সত্যিকারভাবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপ সম্পর্ক ও বিচিত্র সমস্যাকে ইসলামের মারফত মুকাবিলা করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারণা কতজনের আছে? তই এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানদান কারার অবকাশ শেষ হয়ে যায়নি। কোন জাতি নিজস্ব জীবনবোধকে উপেক্ষা করে প্রগতির পথে বা উজ্জ্বলতাময় সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। সাহিত্য যা প্রাণবন্ত, তা একান্তভাবে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বা যুগধর্মের ব্যাপারে নয়, তবু তা সব সময়েই প্রকাশ পায় একটি সংস্কৃতি ও যুগধর্মের মাধ্যমে। একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

আমাদের সহিতসংকট খন্ডিত জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। ইংরাজী সাহিত্য চসারের পর তথাকথিত ধর্মের কড়াকড়ি যেমন প্রকৃত ধর্ম ও জীবনদর্শনকে খন্ডিত করেছিল, তেমনি বিজ্ঞানমূখিতার বাড়াবাড়ির ফলে আজ মানুষ খন্ডিত দর্শনের দাস হয়ে পড়েছে। ফলে সাহিত্যিক মন তার স্বভাবধর্ম থেক বিচ্যুত হয়েছে। গোটা বস্তুসত্তা ও মানবসত্তা প্রতিষ্ঠিত না করলে মহৎ সাহিত্য হয় না। সমগ্র সার্থক সাহিত্যের পেছনে যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, আদর্শ, দর্শন ও জীবনবোধ থাকে, তার সম্পর্কে ধোঁয়াটে ধারণা সাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

এ সম্বন্ধে টলস্টয় তাঁর Art শীষক বইতে লিখেছেন : (Ox, Univ. Press, 1924, P-375) It does not, however, need much experience to perceive that man cannot live with chaos that results when they have on sure chart or general theory by which to steer their course through life. In other words a man is material or spiritual, he has always more or less a religious perception.

amarboi.org

আমাদের যে নিজস্ব জীবনবোধ রয়েছে, তার সুস্পষ্ট সাহিত্যিক রূপ দিতে পারলে জীবনের আনন্দ ও সাধারণ সত্যের উপলব্ধি বাদ দিতে হবে না। কারণ আমাদের জীবনদর্শন শুধু বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধিতে নয়। বৈশিষ্ট্যের মাঝেও সম্ভব বৈচিত্রের সমারোহ। দুনিয়ার সব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের জ্ঞানাহরণের জন্য ইসলামী জীবনদর্শনের রয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। আর ইসলামে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তা নীতিগত-স্বার্থপরতা, নিপীড়ন ও চরমাবাদের বিরুদ্ধে তৌহীদ ও মানবিকতার উদ্বোধন, বুদ্ধির শাসন বা যুক্তির বিরুদ্ধে জোহাদ নয়।

আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু, কিন্তু তা বহুলাংশে হিন্দু সাহিত্যের অনুকৃতি মাত্র। মুসলিম সাহিত্যের এই অনুকরণপ্রিয়তা দূর করে নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক সাহিত্য অনুবীক্ষণী মনোবৃত্তি ও স্নায়বিকতার ফলে ক্ষণিকার আর কণিকার বিশ্লেষণ ও গতি-প্রাণালী নিয়ে ব্যস্ত। এই সাহিত্য আক্সমিকভাবে অস্পষ্ট জিনিস প্রতিভাত হয়েছে, কিন্ত তা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি চিত্রিত করতে চায়নি। সাহিত্যের এই অস্বাভাকি বিকৃত অবস্থ দূর করে সুস্থ সবল জীবনের সহজ প্রকাশ ফিরিয়ে আনতে হবে। একে তো অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার কুয়াসা আমাদের জীবন ও জীবনবোধের আসল রূপ সম্পর্কে একটা ঘোলাটে ভাব তৈরী করেছে; তাছাড়া ইসলামী সমাজও আমাদের দেশে কায়েম হয়নি। কাজেই সাহিত্য, তমদ্দুন ও সমাজের সঙ্গে আমাদের জীবনদর্শনের অতীত, বর্তমান ও ভিবষ্যত যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অপরিসীম। বাঙালী মুসলিমের যে স্বতন্ত্র মানসিকতা, হৃদয়বৃত্তি, সুখ-দু:খ ও আশা-আকাঙ্খা এবং সংস্কৃতিচেতনা রয়েছে, তার ফলে হিন্দু সাহিত্যিকের লেখা সাহিত্যে কিঞ্চিত আনন্দ পাই, কিন্তু সেখানে আমরা নিজেদেরকে খুঁজে পাইনা। বাংলাদেশের সাহিত্য মুসলিম জনসাধারণের মূল্যবোধ, কৃষকের জীবন, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও কিসসা-কাহিনী তৌহীদের বাণী ও সংস্কারকে রূপ দেয়াই হবে সংগত ও শোভন। সাহিত্য মুসলিম রূপ লাভ করেও তার বিশ্বজনীন রূপ অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এই কথাটি বুঝতে না পেরে আমরা যে সাহিত্য রচনা করেছি, কিন্তু হাটের-মাঠের ও খাঁটি-মাটির মানুষের সাক্ষাত বড় একটা পাইনি, সংগ্রামী মুসলিমের সন্ধান পাইনি। জাতীয় জীবন ও আদর্শ বিস্মৃত হলে, তথাকথিত সাহিত্যিকের হাতে হয় সাহিত্যের অনাবৃষ্টি। দেশের জনগণের জীবনবোধের প্রতি অশুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা দৃষ্টি নিয়ে কেউ প্রগতির পথে পা বাড়াতে পারে না। আত্মপরিচয়েই জাতি আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। জীবনের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিছক কল্পনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে না। শুধু কল্পনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হওয়ায় আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম হয়েছে ও মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করতে পারেনি। আমাদের সাহিত্য শুধু বৃদ্ধির দীপ্তি থাকলেই চলবে না, সহানুভূতি ও বাস্তবতা এ দুটোকেই একসঙ্গে পাওয়া চাই। যার মধ্যে থাকবে সীমাহীন বৈচিত্র, এক কথায় জীবনের সমগ্র রূপটি।

অনেক বলেছেন যে, বাঙালী মুসলমান আগে মানুষ তারপর আর কিছু বা আগে বাঙালী তারপর মুসলমান। আবার কেউবা বলেন, আগে মুসলমান তারপর বাঙালী। সত্য কথা হলো, সে আগে মানুষ বলেই বুদ্ধিমত্তা ও জীবনবোধ (ধর্ম) তার অবিচ্ছেদ্য গুণ। সে বাংলাদেশেরও বাসিন্দা; সেজন্য একসঙ্গেই সে মানুষ, মুসলমান ও বাঙালী। এই তিনটিকে আলাদা করার যোগ্য নেই। আর ইসলামী জীবনদর্শন তার মানুষ্যত্ব ও বাঙালীত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে নৈতিকতা সুবিচার ও মানবিকতার দিকে আহবান করে। কোনক্রমেই তার মনুষ্যত্ব, বাঙালীত্ব মুসলমানত্ব আলাদা করা যায় না। এই হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষি তৃজ অর্থাৎ তিনবার জন্মলাভ করে। সে মানুষ যে কোন জীবনবোধের অনুসারী ও কোন একটি দেশের বাসিন্দা।

আমাদের শিল্প-সাহিত্য যেমন একদিকে স্বতস্ফূর্ত, পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ হবে, তেমনি তা আমাদের জীবনবোধ দ্বারাও শান্তি, সুসংহতি সুমিতি, সংযম ও সর্বাঙ্গীণতা লাভ করবে। তবেই আমাদের সাহিত্য

স্বগৌরবে ও সৃষ্টিতে প্রোজ্জল হতে পারবে। অবশ্য জগতের সব দেশের সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে আমাদের নিজের করে নেয়া দোষের তো নয়ই, আমাদের জীবনদর্শন মতে ইবাদতের শামিল বলে মনে করা হয়। সত্য কখনো এক জাতির একচেটিয়া নয়। (রিসালতের) ।

ইকবাল, নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের সাথে মুসলিম সংস্কৃতির সম্পর্ক আরোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। রবীন্দ্রনাথ যে মূলত হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা করলেন, তাতে তিনি কম রেনেসাঁ আনেননি। আর নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলিম দুটোকেই টেনেছেন- তা কিন্তু ধির মাছ না ছুই পানি গোছের। নজরুলের ভেতরে দেখতে পাই উদগ্র স্পৃহা, উজ্জল গতি ও মানবতার জয়গান। তাই নজরুল সাধারণ মানুষের আপনার কবি। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি ও উৎপীড়ন-জর্জরিত সমাজের উপর তাঁর নির্মম কষাঘাত। তিনি যখন যা নিয়ে লিখেছেন, তাতেই মেতে উঠেছেন। তিনি যখন যা নিয়ে লিখেছেন, তাতেই মেতে উঠেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে পারেনি। সেজন্য তাঁর পার্থিব সুরটি ক্ষুণভঙ্গুর। হিন্দুরা তাকে জাতীয় কবি হিসাবে মনে করে না। মুসলমানেরা তাঁকে রেনেসাঁর অগ্রদূত বলে মনে করেন। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির পরিপূর্ণ ছাপ (রবীন্দ্রনাথের মত হিন্দ সংস্কৃতির ছাপ) নজরুলের মেলে না। কারণ ইসলামী সংস্কৃতিতে তাঁর অন্তপ্রেরণাই ছিল সামান্য। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মাঝে অগণিত জাতি ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে-তবু তাদের নিজস্ব হিন্দত্ব ও মুসলমানত্ব বরাবর ঠিকই আছে। আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক ব্যবহার থাকলেও তৌহীদবাদের পূর্ণ বিকাশ নজরুলে মেলা ভারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আধুনিক হিন্দু-বাঙালী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ আছে। সেখানেই তার সার্থকতা। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিমের অপাঠ্য তা বলছি না।

আবার নজরুলে যা পরোক্ষা ও ভাবপ্রবণ ইকবালে তা মূখ্য, স্পষ্ট ও জলন্ত দীপ্ত। নজরুলে সমাজদৃষ্টি আছে কিন্তু তা ইকবালের মত এতটা একাত্ম ও নিবিড় নয়। নজরুল সাহিত্য মুসলিম মানসকে গতিশীল করেছে কিন্ত তার সাংস্কৃতির চেতনাকে পূর্ণত্বে পৌছাতে পারেনি। মুসলমানের নজরুল বা রবীন্দ্রনাথের কাউকেই জীবনবোধের দিক থেকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। নজরুল হিন্দু-মুসলিম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে সৃষ্ট একখানি বিরাট তরঙ্গ, একটি বিপ্লবী স্ফুলিংগ, উল্কার মত। তিনি মুসলিম রেনেসাঁর আগমনী গেয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম রেনেসাঁর কবি নন। কিন্তু ইকবালকে মুসলমানেরা গ্রহণ করেছেন একান্তরূপে। কারণ তিনি মুসলমানের মর্ডান সাদী বা রুমী। তবে বাঙালী মুসলিম আজ অবধি মুসলিম রবীন্দ্রনাথের সন্ধান পায়নি।

বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা কি হবে, সে সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা ভাল মনে করি। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য ও সাহিত্য যে মূলত গ্রামীণ হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জনগণের বোধম্য ভাষাই এই সাহিত্য রূপ পাবে। তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ অনভূতি ও প্রতিচ্ছবি তাদের জবানিতে প্রকাশিত হওয়া চাই। সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান একসঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তৌহীদবাদ। আমাদের সাহিত্য যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাকে যেমন বাদ দেয়া যায় না, তেমনি হুবহু অনুসরণ করাও নিরাপদ নয়। আমাদের বাড়ীতে, দহলিজের কথাবার্তায় যে ভাষা স্বতই ফুটে ওঠে, সেই ভাষার সঙ্গে চলতি সাহিত্যিক ভাষার এক সহজ সমন্বয়েই আমাদের নিজস্ব নতুন সাহিত্যিক ভাষার জন্ম হবে (অবশ্য এ জন্য আমাদের ভাষাকে অযথা আরবী-ফারসী শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত করতে বলছি না)। ছোট গল্প, নাটক কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এই ভাষাকে চালু করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও যথাসম্ভভ এ ভাষার প্রচলন করার প্রয়োজন। সিনমা ও রেডিও মারফত এ ভাষাকে জনপ্রিয় করারও বিস্তৃত অবকাশ রয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনায় সন্ধানী দৃষ্টি রাখলে এ কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। কেবলমাত্র কুরআন শরীফ পড়বার ব্যবস্থা করলেই চলবে না। গোড়া থেকেই সম্ভবমত ও শ্রেণীমত ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক ও তমুদ্দনিক রীতি মাতৃভাষার সাহায্য বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর মনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান থাকলে জ্ঞানের সমগ্র শাখাই ইসলামী শিক্ষার আওতায় পড়বে ও ইসলামী শিক্ষা বলে পরিগণিত হবে। এজন্য তথাকথিত মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবধান তুলে দিত হবে।

সংগীত, চারুকলা ও চলচিত্র সম্পর্কে তথাকথিত ধর্মধারীরা অতি বাড়াবাড়ি করেছেন। হযরত (সা) এর কথা ও জীবনীর সবটুকু (সুবিধামত অংশবিশেষ নয়) যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব যে, তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত শিল্প-কলা পরিহার করতে বলেননি। তিনি স্বয়ং সংগীত ও সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সংগীত যখন মানুষকে কর্মহীন, অলস, সমাজবিরোধী ও নীতিজ্ঞানহীন করে দেয় তখনই তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছেন। আমরা এই বাড়াবাড়িকেই সাধারণ নিয়ম ধরে ..... পরিকল্পনা। শিল্পের অনুপুস্থিতিতে মানব-জীবন দু:সহ। তবে ইউরোপের মত যে কোন আর্টকেই মেনে নেয়া যায় না।

শিল্প মানুষের আচারকে সুসংহত করে, মানুষের মনের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে, সামাজিক সম্পর্ককে সুষ্ঠ ও সুসংহত করে, মানব-জীবনের বিভিন্ন দিকে রশ্মিপাত করে, ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে ও সামাজিকভাবে সৃষ্টি করে। শিল্প আমাদের জীবনদার্শ প্রচারের এক বিরাট হাতিয়ার। শিল্পের মারফত আমরা আমাদের জীবনবোধকে মানুষের মনের পরতে পরতে পৌঁছে দিত পারি। ইসলামী সমাজ গঠনে শিল্পকলার ভূমিকা কোনদিনই অস্বীকার করা যায় না।

সাহিত্য প্রগতির পথ

সাহিত্য প্রগতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় মুসলিম জনগণের অহেতুক রোমান্টিক মনোভাব, অন্যদিকে আধুনিক মুসলিমের শ্লোগানপ্রিয়তা। মুসলিম জনগণ মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম শাসক ও মুসলিম সাহিত্য চেয়ে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু তারা দেখেননি তাঁদের রাষ্ট্রে সংস্কৃতিতে ও সাহিত্য ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ সম্যকভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা। আবার আধুনিকেরা মুসলিম জনগণের এই মনোভাবকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে ইসলামকে বুঝতে, চিনতে ও রূপায়িত করতে অপরাগ হয়ে পড়েছেন। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে নিজস্ব জীবনবোধের ওপর শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সস্কৃতি, ইসলামী সাহিত্য ও সস্কৃতিকে মন্থন করতে হবে। তারপর এই সাধনাকে নিজের জবানীতে স্বতন্ত্রতা ও স্বকীয়তার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। সত্য চিরদিনের; কিন্তু সে সত্যকে অক্ষুন্ন রেখে নিজের জীবনবোধ ও আঙ্গীকের মারফত প্রকাশ করা চাই। দেশের মাটির আকর্ষন, ইতিহাসের ধারা ও বিশ্ব-সংযোগ অক্ষুন্ন রেখে সংযম ও স্থৈর্যের মারফত জাতির অসীম বাসনা, অযুত বেদনা ও অতন্দ্র সাধনা বিকাশ লাভ করবে। মানুষের কাছে যা মূল্যবান, কিন্তু বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, তাকে উদঘাটন করতে হবে। নিজস্ব প্রাণ-মনকে অবলম্বন করেই হবে আমাদের সৌন্দর্যের ও অমরত্বের সাধনা। এজন্য ইতিহাস শিক্ষা প্রণালীর রদবদল করতে হবে। অত্যাচার হিন্দু বা মুসলমানের একচেটিয়া নয়। অজ্ঞনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সমাজ-জীবন থেকে দূর করতে হবে। জীবনের সাধনায় জীবন গঠনের উপাদান শরীফ হওয়া আমাদের চিরন্তন অধিকার। জগতের জন্য আমাদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। মানুষে মানুষে মিলনের আসল বস্তুটি মুখের নয়, বুকেরও । যারাই সত্য-সুন্দরের অভিসারে যাত্রা করেছেন, তারা যে দেশের বা যে জাতিরই হোন, তাদের সবাইকে আমরা যেন সশ্রদ্ধ সালাম জানাতে শিখি। আমাদের সাহিত্যও সংঘাত চলছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য এখনো শৃঙ্খলা ও আত্মশক্তি খুঁজে পায়নি, নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু মানসচেতনা জাগেনি। সাহিত্য অতীত নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না; কিন্তু অতীতকে সঙ্গে নিয়েই চলবে। কারণ মানুষের রসবোধ ও জীবনবোধ

amarboi.org

অতীতের সঙ্গে যুক্ত। অতীতকে শুধু সংগ্রহ করলে হবে না, তাকে উপলব্ধি করে সাধারণ জীবনে কার্যকরী করতে হবে। তবু সত্য ও কল্যাণের সন্ধান করতে হবে। নিছক অতীতমুখী গোরস্তান মানসিকতা ও পশ্চাদমুখিতা ত্যাগ করে পরমতম সহিষ্ণুতা ও নিজস্ব জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্য নতুন মোড় নিতে হবে। নিজেদের প্রচেষ্টার সামান্যের দেশে যেন আমরা ক্ষুন্ন না হই। একটি জীবন্ত জাতির জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিও গতিশীল ও বলিষ্ঠ হতে বাধ্য। কিন্তু এ সহজলভ্য নয়, সাধনা ও অনুশীলনসাপেক্ষ। চিত্তের স্বাভাবিক স্ফুর্তি ও সংযম চাই। ইসামের সমগ্রতা পৌছে দিতে হবে মানুষের সামনে। সত্যিকার মুসলিম অন্য জাতিকে ঘৃণা করে না। (পাগলা কানাই, লালন ফকির) আমর সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির যে পথের কথা বলেছি, সেই পথে চললে বাঙালী মুসলিমের মধ্যে মনীষার ও শক্তিশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব অসম্ভব কল্পনা নয়। আমাদের জীবনবোধ অন্ধ গোষ্ঠীবাদ বা একটি ভাষার সীমায় আবদ্ধ নয়। জীবনবোধই মুসলিমদেরকে এক করেছে ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। আমাদের জীবনবোধের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান ও সাহিত্য তার প্রাণধর্মী প্রকাশ অপরিহার্য। দুনিয়ার সব ভাষার মারফতেই এই জীবনবোধ বিকাশ লাভ করতে পারে। অহেতুক আরবী হরফ ও আরবী-ফারসী আমাদের জীবনবোধের একমাত্র বাহন মনে করার হীন সঙ্কীর্ণতার ফলে আমাদেরকে চিন্তাশীল লোকদের বিদ্বেষ কুড়াতে হয়েছে।

জীবনের পারিপার্শ্বিকতার দিকে জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে স্বকীয় আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে ঢেলে সাজাতে হবে। এ জীবন্ত জীবনবোধই হবে আমাদের সাহিত্যের জীবনকাঠি। মুসলিম মানসের সেই ঔদার্য, ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা আবার আনতে হবে। স্বীয় দু:খ-কালিমাকে লুকিয়ে না রেখে সেগুলো সাধারণো প্রকাশ করে, অনুশীলন করে, আত্মস্থ করে, দুঢ় প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবেই আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নবজীবন লাভ করে স্বগৌরবে প্রদীপ্ত হবে ও আমরা নতুন পথে অগ্রসর হতে পারব।